হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১৫



রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ভূমিকা
- মসজিদে নববী নির্মাণ
- মুসলমানদের মধ্যে ভাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন
- মদিনার সনদ
- মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র
- বদরের যুদ্ধ
- রণক্ষেত্রে ইবলিশের আগমন ও পলায়ন
- আবু জেহেলের করুণ মৃত্যু
- উহুদের যুদ্ধ
- খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ
- হুদায়বিয়ার সন্ধি
- বাইতুর রেদোয়ান
- বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ
- মক্কা বিজয়
- কাবা ঘরে প্রবেশ
- হুনাইনের যুদ্ধ
- তাবুক অভিযান
- বিদায় হজ্জ ও রাসূল (সঃ) এর ইন্তিকাল

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

রাসূল (সা.)-এর মাদানী জীবন

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা হলো 'নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে একমাত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ।'[সূরা আহযাব : ২১] রাসূল (সা.) ৬২২ খ্রিঃ ১২ রবিউল আউয়াল জুমআর দিন বনু নাজ্জার গোত্রের হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'ইনশাল্লাহ এটাই হবে আমাদের মানজিল।' হাদীসে এসেছে, 'রাসূলের মাদানী জীবনের শুরু থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং মুহাজিরগণ ছিলেন মদিনার কর্তৃত্বের অধিকারী।'[সহীহ বুখারী] ওহী প্রাপ্তির পর থেকে রাসূল (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছর তাঁর নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন শেষে মহান মালিকের কাছে চলে যান। সেই ২৩ বছরের ১০ বছর মদিনায় কেটেছে।

এই ১০ বছর সময়টি মূলতঃ ইসলামের বিজয়ের যুগ তথা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের যুগ ছিল। এ পর্যায়ে আমরা রাসূল (সা.)-এর মাদানী যুগের বিশাল কর্মময় জীবন থেকে গুরুত্ব পূর্ণ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরতে চাই। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করা হলো।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদিনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা। মসজিদ নির্মাণের জন্য তিনি সেই জায়গা নির্ধারণ করলেন যেখানে গিয়ে উট যাত্রা বিরতি করেছিল। সেই জমির মালিক ছিলো দু'টি ইয়াতিম বালক। রাসূল (সা.) তাদের নিকট থেকে নায্য মূল্যে সেই জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এবারও রাসূল (সা.) সাধারণ শ্রমিকদের ন্যায় মসজিদের ইট ও পাথর বহন করেছিলেন। মসজিদটি সাধারণ ভাবে নির্মিত হয়। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুর গাছের খুঁটি ও খেজুর পাতার ছাউনি ছিল মসজিদ তৈরির উপকরণ।

মসজিদের মেঝ ছিল কাঁচা এবং বৃষ্টি হলেই মসজিদের ভিতরে কাদা জমে যেত। তাই কিছু দিন পর পাথর বিছিয়ে মেঝ পাকা করে নেওয়া হয়। মসজিদের এক পাশে একটি উঁচু চত্বর নির্মাণ করা হয়। এর নাম রাখা হয় 'সুফফা'। বাড়িঘরহীন নও-মুসলিমদের এটি ছিল তাদের থাকার স্থান।

মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এর কাছেই রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের জন্য কয়েকটি ঘর তৈরি করেন। এগুলো কাঁচা ইট ও খেজুর গাছ দ্বারা নির্মাণ করা হয়। এ ঘরগুলো ৬-৭ হাত করে চওড়া এবং দশ হাত লম্বা। এর সাদ এতটা উঁচু ছিল যে, একজন লোক দাঁড়ালে তা স্পর্শ করা সম্ভব ছিল। কম্বলের পর্দা দরজায় ঝুলানো ছিল।

মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন

রাসূল (সা.) মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মিলন ও মিল মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, 'জাহেলি যুগের রীতিনীতির অবসান ঘটানো, ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য মিটিয়ে দেয়াই ছিল এ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মূল লক্ষ্য।

এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উচু নিচুর মানদন্ড তাকওয়া ব্যতিত অন্য কিছুতে নেই। তাঁদের মধ্যকার এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করা ছিল রাসূল (সা.)-এর অনন্য রাজনৈতিক দূনদর্শিতা ও বিচক্ষন্নতার প্রমাণ। সেই সময় মুসলমানেরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এই ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন ছিল তার চমৎকার সমাধান।

মদিনার সনদ

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল জুমআর দিন রাসূল (সা.) মদিনা নগরীতে আগমন করেন। এ সময় সেখানে বসবাসরত বনু আউস এবং বনু খাযরাজ সম্প্রদায় দুটির মধ্যে ছিলো গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ। তাই কলহে লিপ্ত এ দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন ও মদিনায় বসবাসরত সকল গ্রোত্রের মধ্যে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূল (সা.) ৪৭ টি ধারা বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন করেন যা ইতিহাসে মদিনার সনদ নামে পরিচিত। এটিই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। তবে ইবনে হিশামের মতে এ ধারা সংখ্যা ৫৩ টি।

মদিনার এ সনদ বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। এতে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যেবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সব ধরনের নাগরিক পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। এ সনদের মাধ্যমে রাসূল (সা.) যুগান্তকারী চুড়ান্ত নীতি নির্ধারণ ও বিপ্লবী নেতার স্বীকৃতি লাভ করেন। এর মধ্য দিয়েই মদিনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের পথ সুগম হয়। এ সনদের দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্র ও ধর্ম সহাবস্থানের ফলে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে। এ সনদকে সকল পক্ষ মেনে নিয়েছিলেন এবং স্বাক্ষর করেছিলেন।

মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ সনদ সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ ইয়াসরিববাসীকে সুসংহত করে এবং মদিনা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধশালীকরণে বিরাট অবদান রাখে। মূলতঃ এ সনদ ছিল আরব জাহানের শান্তি ও সহাবস্থান এবং সম্প্রীতি স্থাপনের এক মহা-পরিকল্পনা। তাই ঐতিহাসিক ওয়েল হাউছেন বলেন, 'এ সংবিধানই অরাজকতাপূর্ণ একটি নগরকে রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নিত করে।' তাছাড়া এ সনদই প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা.) নিছক একজন ধর্ম প্রচারকই নন, বরং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র

মক্কায় মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের মাত্র আরো তীব্রতর হলে মক্কা থেকে মুসলমানেরা বেরিয়ে যায় এবং মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা দেখে কাফেরদের ক্রোধ আরো বেড়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তখনো ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করেনি। ঐ সময় মদিনায় সে ছিল আনসারদের নেতা। মক্কার পৌত্তলিকরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হুমকিপূর্ণ একটি চিঠি লিখেছিলেন। মদিনায় সে সময় তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

এমনকি রাসূল (সা.) যদি মদিনায় না যেতেন তাহলে মদিনাবাসীরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাদের বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করতেন। সেই চিঠিতে তারা লিখেছিলো যে, আপনারা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কারণে আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি যে, হয়তো আপনারা তার সাথে লড়াই করুন অথবা তাকে মদিনা থেকে বের করে দিন। যদি তা না করেন তবে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে আপনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা করবো, আর আপনাদের মহিলাদের সম্মান বিনষ্ট করবো।'

এ চিঠি পাওয়ার পরই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মক্কার কাফেরদের নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কেননা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে তার মনে আগে থেকেই প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূল (সা.) মদিনার রজামুকুট তার নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছেন। চিঠির নির্দেশনা অনুযায়ী আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সহযোগিরা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলো।

এ খবর রাসূল (সা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি নিজেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, মনে হয় মক্কার কুরাইশদের হুমকিতে তোমরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছ। শুনে রাখ, তোমরা নিজেরা নিজেদের যতো ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছ, মক্কার কুরাইশরা তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কি নিজেদের সন্তান এবং ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও?

রাসূল (সা.)-এর কথা শোনার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সহযোগিরা ছত্র-ভঙ্গ হয়ে গেল এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত রইল।' কিন্তু কুরাইশদের সাথে তার গোপন যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। শুধু তাই নয়, বরং মুসলমানদের বিরুধিতায় শক্তি অর্জনের জন্য সে ইহুদীদের সাথেও যোগাযোগ করে চলতো, যেন প্রয়োজনের সময় ইহুদীরা তাকে সাহায্য করে।

বদরের যুদ্ধ [দ্বিতীয় হিযরী, ৬২৪ খ্রিঃ]

দ্বিতীয় হিযরীরর শাবান মাসে মোতাবেক ৬২৩ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে কুরাইশদের এক বিরাট কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে এগিয়ে আসছে। সে কাফেলায় কুরাইশদের বহু সম্পদ এবং বানিজ্যিক সম্ভার রয়েছে। এই কাফেলায় এক হাজার উটের পিঠে প্রায় ৫০ হাজার আশরাফী মূল্যের বিভিন্ন ব্যবসায়িক জিনিসপত্র ছিল। এ সব সম্পদ হেফাজতের জন্য মাখরামা ইবনে নওফেল ও আমর ইবনুল আসসহ কুরাইশ বংশোদ্ভুত ৩০ অথবা ৪০ জন লোক ছিল।

রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এটা কুরাইশদের কাফেলা। এতে প্রচুর সম্পদ রয়েছে । তোমরা ওদিকে চলে যাও। হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা ঐসব সম্পদ তোমাদের হস্তগত করে দিবেন।' হিজাজের কাছাকাছি এসে আবু সুফিয়ান ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলো এবং সে মুসলমানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল।

শেষপর্যন্ত সে বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারলো যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথীদেরকে তোমার ও তোমার কাফিলার উপরে আক্রমণ চালাতে বলেছে। সুতরাং আবু সুফিয়ান অতি সাবধানতার সাথে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। সে এ বিপদাশংকায় দামদাম ইবনে আমর গিফারীকে সাহায্যের জন্য মজুরির বিনিময় মক্কায় পাঠিয়ে দেন। সে মক্কার মরুভূমিতে পৌঁছেই তার উটের উপর বসেই এই বলে চিৎকার করে বলছে যে, 'হে কুরাইশগণ, মহাবিপদ! মহাবিপদ!

‘তাদের কাফেলার উপর মুহাম্মদ তাঁর দলবলসহ আক্রমণ করেছে। মনে হয় তোমরা তা আর রক্ষা করতে পারবে না।

সুতরাং সাহায্যের জন্য সবাই এগিয়ে যাও।’ কাফেলার সাথে যে মালামাল ছিল তার সাথে বহু লোকের স্বার্থ জড়িত ছিল। ফলে তা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। তাই তার ডাকে সাড়া দিয়ে কুরাইশদের সমস্ত বড় বড় সরদার সবাই যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হলো। তারা যুদ্ধের জন্য প্রায় এক হাজার যোদ্ধার এক বিরাট বাহিনী গঠন করে। এ বাহিনী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনায় ও জাঁকজমক সহকারে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে। এদের হৃদয়ে একমাত্র সংকল্প মুসলমানদের অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। যেন নিত্য কার এ ঝঞ্ঝাটি চিরদিনের জন্য ক্ষতম হয়ে যায়। বস্তুত একদিকে তাদের বিপুল সম্পদ রক্ষার আগ্রহ, অন্যদিকে পুরনো দুশমনি ও বিদ্বেষে এসব ক্রোধ ও উন্মাদনার সাথে কুরাইশ বাহিনী মদিনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এ পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে সংগে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাসূল (সা.) মুহাজির ও আনসারদেরকে একত্রিত করে তাদের সামনে এসব পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বর্ণনা তুলে ধরলেন। একদিকে মদিনার উত্তর দিকে রয়েছে ব্যবসায়ী কাফেলা, আর দক্ষিণ দিক থেকে আসছে কুরাইশদের সজ্জিত সেনাবাহিনী। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, এর যেকোন একটি তোমরা লাভ করবে। এখন বলো, তোমরা এর মধ্যে কোনটির মোকাবেলা করতে চাও? সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) উঠে দাড়ালেন ও তাঁর মতামত অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করলেন। এরপর মুহাজিরদের ভিতর থেকে মিকদাদ ইবনে আমর দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে যে দিকে চলতে বলেছেন সেদিকে এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! আমরা বনী ইসরাইলদের মতো বলবো না।

বনী ইসরাইল যেমন মুসা (আ.)-কে বলেছিলো, 'তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে রইলাম।' এরপর রাসূল (সা.) আনসারদের মতামত চাইলেন। তখন ইবনে মুয়ায বললেন, 'আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার দাওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা পরম সত্য। তাছাড়া আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই কাজে পরিণত করুন। যে মহান সত্তা আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! যদি আপনি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, তবু আপনার সাথে আমরা থাকবো এবং এতে আমাদের একটি লোকও পিছপা হবে না।

আমরা যে শপথ নিয়েছি, যুদ্ধকালে তা প্রতি পদে পদে পালন করে যাব। প্রকৃত আত্মোৎসর্গকারীর ন্যায় আমরা শত্রুর মোকাবেলা করে যাব। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল এবং শত্রুর মুকাবিলায় সংকল্পে অবিচল। আশা করি, আল্লাহ আপনাকে আমাদের এমন তৎপরতা দেখবার সুযোগ দেবেন, যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর রহতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে আপনি এগিয়ে চলুন।' সা'দের এ বক্তব্য শুনে রাসূল (সা.) খুশি হলেন এবং খুবই উৎসাহ বোধ করলেন। এরপর রাসূল (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলা করা হবে।

১২ রমজান রাসূল (সা.) আল্লাহর উপর ভরসা করে মাত্র তিনশ' তের জন মুসলমান নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। ১৬ রমজান তারা বদরের কাছে পৌঁছেন। এটি মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রান্তর। রাসূল (সা.) সেখানে ছাউনি ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। অপর দিকে আবু জাহেলের নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের সজ্জিত বাহিনী বদরে পৌঁছে যায়।

১৭ রমজান ফজরের পর রাসূল (সা.) মুসলিম সৈন্যদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করেন। এরপর যুদ্ধের নিয়ম মোতাবেক সৈন্যদের

শ্রেণিবিন্যাস করেন। যুদ্ধ শুরুর আগে রাসূল (সা.) আল্লাহর দরবারে হাত তোলেন এবং অতীব বিনয় ও নম্রতার সাথে বলেন, 'হে আল্লাহ! এ কুরাইশরা চরম উদ্ধত্য ও অহমিকা নিয়ে এসেছে তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। অতএব, আমাকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে, এখন সে সাহায্য প্রেরণ করো। হে আল্লাহ! আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে জগতে তোমার ইবাদত-বন্দেগী করার আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এ সময় মহান আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন, 'আমি তোমাদের সাহায্য করবো, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।'(সূরা আনফাল: ৯)

রণক্ষেত্রে ইবলিসের আগমন ও পলায়ন

এ যুদ্ধে অভিশপ্ত ইবলিস ছোরাকা ইবনে মালেকের আকৃতি ধারণ করে এসেছিল। যুদ্ধের ময়দানে সে বলেছিল,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَ إِنِّى جَارٌلَّكُمْ

فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيٓءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيٓ أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيٓ

أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

'ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন শয়তান ঐ লোকদের আমলকে তাদের সামনে চমৎকার করে তুলে ধরেছিল এবং বলেছিল, 'আজ কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তোমদের সাথেই আছি। কিন্তু যখন দুই দল সামনাসামনি হলো তখন সে পিছনে হটে গেল এবং বলতে লাগল তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ বড়ই কঠিন শাস্তিদাতা।'(সূরা আনফাল : ৪৮)

এ সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাদের ব্যবস্থা গ্রহণ দেখে সে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু হারেস ইবনে হিশাম তাকে ধরে ফেললো। তখন ইবলিস হারেসের বুকে প্রচন্ড ঘুষি মারলো, সে মাটিতে পড়ে গেল। এ সময় কাফিররা তাকে বলতে লাগল, ছোরাকা তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বল নাই যে, আমাদের সাহায্য করবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না! ছোরাকা বলল, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা। আল্লাহকে আমার ভয় হচ্ছে। তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। এরপর ইবলিস সমুদ্রে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

আবু জাহেলের করুণ মৃত্যু

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, মা'য ইবনে আমর ইবনে জামুহ বলেছেন, আবু জাহেল কাফেরদের তীর তলোয়ারের দুর্ভেদ্য পাহারার ভেতর ছিল। কাফেররা বলছিলেন, আবু জাহেলের নিকট কেউ যেন পৌঁছতে না পারে।

মা'য ইবনে আমর বলেন, 'আমি আবু জাহেলকে চিনতাম না, কিন্তু তাদের কথা শুনে আমি আবু জাহেলকে চিনে রাখলাম এবং তার কাছাকাছি থাকতে লাগলাম। সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমি তার উপর হামলা করলাম। তাকে এমন আঘাত করলাম যে, তার পা হাঁটুর নিচে দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঝরে পড়া খেজুরের মত তার পা উড়ে গেল। আবু জাহেলকে আঘাত করার সাথে সাথে তার পুত্র একরামা আমার কাঁধ বরাবর তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। এতে লড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছিল। আমি তখন হাতের কর্তিত অংশ পায়ের নিচে রেখে এক ঝটকায় হাত থেকে পৃথক করে ফেললাম। এরপর মাউয ইবনে আফরা (রা.) আবু জাহেলের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর দুশমন সেখানেই লুটিয়ে পড়লো।

অতপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জাহেলের ধড়ে পা রেখে মাথা কেটে রাসূল (সা.)-এর সামনে হাজির করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জাহেলের মাথা। রাসূল (সা.) বললেন,

চলো! আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা নবী (সা.)-কে আবু জাহেলের লাশ দেখাতে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, ও হচ্ছে এই উম্মতের ফিরাউন।

এ যুদ্ধে মুসলমানেরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সহস্রাধিক সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীকে সুচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাদের সমস্ত অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। এ যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা আবু জাহেল, উতবা, শাইবাসহ ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্ধী হয়। এ পরাজয়ের ফলে কুরাইশদের মেরুদন্ড একেবারে ভেঙে যায়। অপর দিকে মুসলমানদের পক্ষে মাত্র ৮ জন আনসার এবং ৬ জন মুহাজির শাহাদাত বরণ করেন।

উহুদের যুদ্ধ [তৃতীয় হিযরী, ৬২৫ খ্রিঃ]

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিলো যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার মত। এ ঘটনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সারা আরবগোষ্ঠীকে প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত করে। এ যুদ্ধে মক্কার যেসব বড় বড় সরদার নিহত হয়েছিল, তাদের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য তারা অস্থির হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে ইহুদীদের যেসব গোত্র মুসলমানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিল তারা চুক্তি ভঙ্গ করে খোলাখুলিভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মদিনার এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি চারদিক থেকে বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তৃতীয় হিযরী প্রথম সপ্তাহে রাসূল (সা.) দুত মারফত জানতে পারেন যে, কুরাইশ বাহিনী মদিনার প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো মদিনার একটি চারণভূমি পর্যন্ত সাফ করে ফেলেছে।

এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) সাহাবাদের নিকট পরামর্শ চাইলেন যে, কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলা কি মদিনায় বসে করা হবে, না বাইরে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে? এ সময় অনেক যুবক সাহাবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমরা বাইরে যেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। রাসূল (সা.) তাদের দৃঢ়তা দেখে মদিনার বাইরে যেয়ে যুদ্ধ করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মদিনা থেকে ওহুদ পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। কুরাইশ বাহিনী মদিনার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছাউনি স্থাপন করে। এ যুদ্ধে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩ (তিন) হাজার। এর একদিন পর রাসূল (সা.) জুমআর নামাজের পর এক হাজার সাহাবী নিয়ে মদিনা থেকে ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু, প্রতি মধ্যে যুদ্ধ হবে না এই বলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে তিনশ' লোক হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মাত্র সাতশ' লোক নিয়ে রাসূল (সা.) ওহুদের প্রান্তরে পৌঁছে তাঁর সেনা বাহিনীকে এমনভাবে মোতায়েন করেন যে, পাহাড় পিছন দিকে থাকে আর কুরাইশ সৈন্যদের অবস্থান থাকে সামনের দিকে। পিছন দিকে পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটি গিরি পথ ছিল এবং সে দিক থেকেও আক্রমণের কিছুটা আশংকাও ছিল। তাই রাসূল (সা.) সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজসহ নিয়োজিত করেন এবং তাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, এ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কাউকে আসতে দেয়া যাবে না। এমনকি তুমি এখান থেকে কোন অবস্থায় নড়বে না। এমনকি যদি দেখ যে, পাখিরা আমাদের গায়ের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও তুমি নিজের স্থান ত্যাগ করবে না।'

হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) তাঁদেরকে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা দেখো যে চড়ুই পাখি আমাদেরকে ঠোকরাচ্ছে তবুও নিজের জায়গা ছাড়বে না, যদি আমি ডেকে না পাঠাই। যদি তোমরা দেখো যে, আমরা শত্রুদের পরাজিত করেছি এবং এক সময় তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি তবুও নিজেদের জায়গা ছাড়বে না।'(সহীহ আল বুখারী

ওহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেই ছিল ইসলামের পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তাঁর ডান হাতে এমন আঘাত করে যে, তারঁ হাত কেটে যায়। তখন তিনি বাম হাত দিয়ে ইসলামের পতাকা তুলে ধরেন। কিন্তু শত্রুদের হামলায় তাঁর বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন বাহু দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে

ইসলামের পতাকা উর্বেধ তুলে ধরেন। সেই অবস্থায় মুসআব (রা.) শাহাদত বরণ করেন। তাঁর হত্যাকারী ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে কোম্মা। হযরত মুসআব (রা.)-এর চেহারা অনেকটা রাসূল (সা.)-এর চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। কোম্মা মনে করেছিলো সে রাসূল (সা.)-কে হত্যা করেছে। এই ভেবে কোম্মা হযরত মুসআব (রা.)-কে হত্যা করার পর কাফেরদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলেছিলো, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে।

সত্তর জন সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন আনসার। মোহাজের শহীদ সংখ্যা ছিলো মাত্র চার জন। বাকী একজন ইহুদী ছিলেন। অপরপক্ষে ২২ জন মতান্তরে ৩৭ জন কাফের এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। শহীদদের মধ্যে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যিয়াদ ইবনে সাকান (রা.), হযরত আম্মারা ইবনে ইয়াযিদ ইবনুস সাকান (রা.), হযরত সা'দ ইবনে রাবি (রা.), হযরত আমর ইবনে সাবেত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা.), হযরত ওমর ইবনে জামুহ (রা.), হযরত হানজালা (রা.), হযরত হামজা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে উমায়ের (রা.) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ [৫ম হিযরী, শাওয়াল মাস]

পঞ্চম হিযরীর শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ বছরটিতে মুসলমানেদের বেশির ভাগ সময় সামরিক তৎপরতা পরিচালনার ফলে জাজিরাতুল আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিদিকে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটে। এ সময় বনু নযীর ও ওয়াইলের ইহুদীদের একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে মদিনার উপর হামলা চালিয়ে রাসূল (সা.)-কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আহবান জানায়। তারা আরবদের বহুসংখ্যক গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত করে এবং এই মর্মে প্রস্তাব দেয় যে, সবাই মিলে একসাথে আক্রমন করলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে খুব সহজে

ধবংস করা যাবে। কুরাইশরা এরূপ প্রস্তাবের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। অবশেষে ইহুদী ও কুরাইশদের সমন্বয়ে প্রায় দশ হাজারের মত এক বিরাট বাহিনী ও তাদের দলপতি আবু সুফিয়ান যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন।

রাসূল (সা.) মদিনা আক্রমণের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে মদিনার উত্তর দিকে পরিখা বা খন্দক খনন করালেন। কেননা মদিনার উত্তর দিকে খোলা ছিল অন্য তিন দিকে পাহাড় পর্বত এবং খেজুরের বাগান দ্বারা ঘেরাও ছিল। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূল (সা.) নিজেই পরিখা খননের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ৫ম হিযরী ৮ যিলক্বদ মাসে রাসূল (সা.) নিজেই এ খনন কাজ উদ্বোধন করেন এবং প্রতি দশজন লোকের মাঝে দশ গজ ভূমি ভাগ করে দেন। বিশ দিনে প্রায় তিন হাজার মুসলমান এক বিরাট পরিখা খনন করেন। খন্দক খননে মুসলমানেরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছিলেন এবং প্রচন্ড ক্ষধা সহ্য করেছিলেন।

হযরত আবু তালহা বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে ক্ষুধার কথা বললাম এবং পেটের কাপড় খুলে একটি পাথর দেখালাম, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদেরকে তাঁর পেটে দুইটি পাথর বাধা দেখালেন।' সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এ সময় হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে ক্ষুধায় কাতর দেখে একটি বকরির বাচ্চা জবেহ করেন এবং তাঁর স্ত্রী এক সাআ অর্থাৎ আড়াই কেজি যবের রুটি তৈরি করেন। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট গোপনভাবে বলেন যে, আপনার কয়েকজন ঘনিষ্ট সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাসায় একটু আসুন। কিন্তু রাসূল (সা.) খনন কাজে নিয়োজিত সকল সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হন। সাহাবাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। সকল সাহাবা পেট ভরে রুটি গোশত খেলেন। উনুনের উপর গোশতের হাড়ি

তখনো টগবগ করে ফুটছিল। রুটি যতো তৈরি করা হচ্ছিল পরিবেশন করা হচ্ছিল কিন্তু শেষ হচ্ছিল না।

ইমাম বুখারী হযরত জাবের থেকে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা পরিখা খনন করছিলাম। হঠাৎ একটি বড় পাথর বের হয়ে পড়লো। কিছুতেই সেটি আমরা নড়াতে পারছিলাম না। আমরা তখন রাসূল (সা.)-কে এ কথা জানালাম। তিনি বলেন, আমি আসছি। আল্লাহ রাসূলের পেটে তখনো পাথর বাধা ছিল। তিনি কোদাল দিয়ে পরিখার ভিতরে সেই পাথরের আঘাত করলেন। সাথে সাথে সেই পাথর ধুলাবালির স্তুপে পরিণত হলো।'

যথাসময়ে মদিনার তিন দিক থেকে তিন দলে বিভক্ত হয়ে শত্রু বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করে। এ আক্রমণ ছিলো অত্যন্ত ভয়াবহ। শত্রুরা প্রায় এক মাস এভাবে মদিনা অবরোধ করে রাখে। কিন্তু এরপরও অবরোধকারী কিছুতেই পরিখা পার হতে পারে নাই। আর রাসূল (সা.) তাঁর সৈন্যদেরকে পরিখার বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করে রাখেন। কখনো কখনো তাদের আক্রমণ এতো তীব্র রূপ ধারণ করতো যে, তাদেরকে পরিখার এপার থেকে প্রতিহত করার জন্য পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা হবতে হতো। এ যুদ্ধের ফলে নামাজও পর্যন্ত কাযা করতে হয়েছে।

ইবনে কাছিরে উল্লেখ করা হয়েছে, পঞ্চম হিযরী শাওয়াল মাসে সমস্ত মুশরিক, ইয়াহুদি ও বিভিন্ন গোত্র সম্মিলিতভাবে প্রায় ১০/১৫ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্রমণ করে। মদিনার উঁচু অংশে তাবু স্থাপন করে নিচে ও উপরের দিক থেকে তারা অবরোধ করল। আর রাসূল (সা.) মদিনার উত্তর দিকে খন্দক খনন করলো, যাতে নবীজি (সা.) নিজেই খন্দককাজে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলের নেতৃত্বে সানা পাহাড়কে পিছনে রেখে শত্রুদের দিকে মুখ করে তিন হাজার

সৈন্যের সমাবেশ করেন। একমাস ধরে তাদের অবরোধ চলছিল। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত।

এদিকে বনু কুরাইজার ইহুদি গোত্র যারা রাসূলের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল, তারাও মুশরিক ও ইহুদি আক্রমণকারী মহাজোট বাহিনীর সাথে গোপনে হাত মেলাল। মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। চুক্তি লঙ্ঘন করলো। তাদের সাথে ৮০০ যোদ্ধা ছিল। সমর-সরঞ্জাম অনেক বেশি ছিল। মুসলমানদের অবস্থা ভয়ানক ও কঠিন হলো। এদিকে প্রচন্ড ঠান্ডা, কঠিন খাদ্যসংকট, ঘরের মধ্য থেকে বিদ্রোহ আর মহাজোটের হাজার হাজার সৈন্যের আক্রমণ। কুরআনের ভাষায়,

إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا

'শত্রুরা যখন তোমাদের উপর হতে, নিচ হতে তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল, যা দেখে তোমাদের চোখ ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের প্রাণ ভয়ে যেন কন্ঠনালীতে এসে পড়েছিল। আর তোমরা আল্লাহর সাহায্যের বিষয়ে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে।'[সূরা আহজাব: ১০]

হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, 'খন্দকের যুদ্ধের সময় আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, আমরা কি করতে পারি? নবীজি আমাদের বললেন : 'তোমরা পড়: اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتَنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا 'হে আল্লাহ আপনি আমাদের মর্যাদা রক্ষা করুন, আমাদের ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দিয়ে বদলে দিন।'[মসনাদে আহমদ]

হযরত হুজায়ফা (রা.) বলেন : 'কঠিন ঠান্ডায় ও ক্ষুধায় আমরা কাতর। রাসূল (সা.) আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি বললাম আমি আপনার হুকুম পালন করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, 'যাও' শত্রুদের অবস্থা দেখ ও আমাকে জানাও।

আমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু করে বসো না।' তিনি আমার জন্য দো'য়া কললেন, 'হে আল্লাহ! তার সামনে হতে, পিছন হতে, ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, উপর হতে এবং নিচ হতে তাকে হিফাজত করো।'

হুজায়ফা (রা.) বলেন : ঐ রাতের মতো ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থা আর কখনো দেখিনি, বইছে ভয়াবহ তুফান, চারিদিকে অন্ধাকর ছেয়ে গেছে। আকাশে প্রচন্ড মেঘের গর্জন, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি আবু সুফিয়ানকে চিনতাম না। সেখানে গিয়ে দেখলাম, প্রচন্ড 'টরনেডোর' বাতাস তাদের রান্নার ডেকসিগুলো পর্যন্ত উল্টিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত উপড়ে ফেলে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। আমি দেখলাম, পাথর উড়ে উড়ে তাদের উপর পড়ছিল। আল্লাহর শপথ! তুফান শুধু ঘর্ণির আকারে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছিল। তাদের অর্ধহাত বাইরেও ছিল না। উপায়হীন অবস্থায় আবু সুফিয়ান বলতে ছিল, 'হে কোরাইশদের দল! আল্লাহর শপথ! আমাদের আর দাড়ানোর জায়গা নেই। আমাদের পশু ও উটগুলো ধবংস হয়ে গেছে। বনু কোরাইজাও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সাথে। তুফান আমাদেরকে অস্থির করে দিয়েছে। আমাদের রান্নার কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁবু ও থাকার স্থানও লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তোমরাও বিরক্ত হয়ে পড়েছো। আমি তোমাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।' 'চল, ফিরে চল' বলে পাশে বসিয়ে রাখা উটে বসে রওনা হলো। আমি যখন ফিরে আসতে ছিলাম, দেখলাম বিশ জন অশ্বারোহী আমাকে বললেন, 'যাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সংবাদ দাও, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জন্য যথেষ্ট ও তাঁর শত্রুদেরকে তিনি পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেছেন।

কুরআনের বক্তব্য:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, কুরাইশ বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝার বাতাস প্রেরণ

করেছিলাম আর পাঠিয়েছিলাম এমন সৈন্যবাহিনী যা তোমাদের চামাড়ার চোখ অবলোকন করেনি। তোমরা যা কিছু করো সবকিছু আল্লাহ তা'য়ালার নজরে আছে।'[সূরা আহজাবঃ ৯]

এ আয়াতে যে প্রচন্ড বায়ুর কথা বলা হয়েছে, নবীজি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং আদ সম্প্রদায়কে 'দাবুর' দিয়ে ধবংস করা হয়েছে।'

আল্লাহর 'বাতাস বাহিনী' কিভাবে কুরাইশদের সম্মিলিত মহাজোটের সৈন্য বাহিনীকে তছনছ করে দিল যারা এক মাস পর্যন্ত মদিনাকে অবরোধ করে রেখেছিল। তাদেরকে এ মুহূর্তে তলপিতলপাসহ গুটাতে বাধ্য করা, তাদের তাঁবু, রান্নার ডেকসি, খাদ্যসামগ্রী, পশু ও উট সবকিছুর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন করে দিলো যে বাতাস তাই আল্লাহর একক সাহায্য।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

মদিনায় থাকা অবস্থায় রাসূল (সা.) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর সঙ্গে মক্কায় যাওয়ার জন্য মদিনায় এবং মদিনার আশপাশে ঘোষণা করে দিলেন। অধিকাংশ আরব ইতস্তত করছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদিনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি তাঁর কসওয়া নামক উটনীতে আরোহন করে ৬ষ্ঠ হিযরীর ১ লা যিলকাদ মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। সফর সঙ্গী হিসেবে হযরত উম্মে সালমা (রা.)ও রওনা হলেন। সাহাবাদের মধ্যে চৌদ্দশ মতান্তরে পনেরশ সাহাবা তাঁর সাথে যাত্রা করেন।

তিনি কোষবদ্ধ তলোয়ার সাথে নিলেন। কারণ কোন ধরনের যুদ্ধ করার অভিসন্ধি তাঁর ছিল না।

রাসূল (সা.) আশংকা করছিলেন যে, কুরাইশরা চিরাচারিত পন্থায় তাঁকে হয় আল্লাহর ঘর যিয়ারতে বাধা দেবে, অথবা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে। এ

আশংকার কারণে যারা সফর সঙ্গী হতে চেয়েছিল তাদের অনেকেই যাত্রা স্থগিত করেছিল।

যলু হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে রাসূল (সা.) তাঁর হাদীকে সজ্জিত করলেন। সাথে কুরবানীর বহরও নিয়ে চললেন এবং একই সাথে উমরার এহরাম বেঁধে নিলেন। যাতে কুরাইশরা তাঁর তরফ থেকে যুদ্ধের আশংকা না করে এবং তিনি যে শুধুমাত্র আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারে। কাফেলার আগে খাজাআ গোত্রের একজন গুপ্তচরকে কুরাইশদের মনোভাব জানার জন্য প্রেরণ করা হলো। আসফান নামক জাযগায় পৌঁছার পর গুপ্তচর এসে খবর দিল যে, কুরাইশ বাহিনী সমবেত হয়েছে। তারা বিরাট উটের বহর নিয়ে আপনার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করছে যে, আপনাকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে তারা কুরাউল গামীমে এগিয়ে এসেছে। এদিকে রাসূল (সা.) কুরাউল গামীমের প্রধান সড়ক ছেড়ে অন্য পথে মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। পাহাড়ী এলাকা দিয়ে তারা ছানিয়াতুল মারার নামক স্থানে পৌঁছেন। এরপর ছানিয়াতুল মারার থেকে রাসূল (সা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে হুদায়বিয়া উপ্যকায় পৌঁছে যান। এটি ছিলো মক্কার অদূরে।

রাসূল (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কার কুরাইশদের নিকট এ কথা বোঝানোর জন্য পাঠালেন যে, রাসূল (সা.) কোন যুদ্ধ করতে আসেননি বরং উমরা করতে এসেছেন। হযরত উসমান (রা.) মক্কায় প্রবেশ করলেন। সেখানে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হলো। উসমান (রা.) রাসূল (সা.)-এর বার্তা তার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হলেন। এরপর তিনি আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সাথে দেখা করেন এবং রাসূল (সা.)-এর বার্তা পৌঁছিয়ে দেন। তারা উসমান (রা.)-কে বললো, 'তুমি যদি কা'বা তাওয়াফ করতে চাও তবে তাওয়াফ করে নাও।' উসমান (রা.) বললেন, রাসূল (সা.) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি করবো না।' কুরাইশরা হযরত উসমান (রা.)-কে আটক করে রাখে।

ওদিকে রাসূল (সা.) ও মুসলমানেরা শুনতে পারলেন যে, তারা উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছেন।

বাইয়াতুর রিদওয়ান

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল (সা.) যে মুহূর্তে শুনলেন যে, উসমান (রা.) নিহত হয়েছেন, সেই মুহূর্তেই বললেন, 'কুরাইশদের সাথে লড়াই না করে স্থান ত্যাগ করবো না।' এ কথা বলার পর তিনি সাহাবাদের বাইয়াতের আহবান জানালেন। সাহাবা কেরাম (রা.) অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন এবং এ মর্মে বাইয়াত করলেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কেউ পালায়ন করবে না। এটাই 'বাইয়াতুর রিদওয়ান'। রাসূল (সা.) একটি গাছের নিচে এই বাইয়াত গ্রহণ করেন। এজন্য এই বাইয়াতকে 'বাইয়াতুশ শাজারাহ' বলা হয়ে থাকে। বাইয়াত গ্রহণ শেষে হযরত উসমান (রা.) ফিরে এলেন এবং তিনিও বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

ঐতিহাসিক সন্ধির শর্তসমুহ

পরিস্থির নাজুকতা উপলব্ধি করে মক্কার কুরাইশরা দ্রুত সোহায়েল ইবনে আমরকে সন্ধি করার জন্য রাসূল (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাকে রাসূল (সা.)-এর সাথে আপোষ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই আপোষের মূল লক্ষ্য ছিলো মুহাম্মদ (সা.) এ বছরের মত মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যাবে। সোহায়েল বেশ কিছু সময় রাসূল (সা.)-এর আলাপ আলোচনা করেন। এরপর সন্ধি করার জন্য ঐক্যমত হলে সন্ধির শর্তাবলী প্রণয়ন করা হলো। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

(১) রাসূল (সা.) এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলমানেরা মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। তাদের নিকট আত্মরক্ষামূলক কোষবদ্ধ একখানা তরোবারী থাকবে। উক্ত তিন দিন মক্কার লোকজন অন্যত্র অবস্থান করবে।

(২) উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এই সময়ে জনসাধারণ সকলে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদে থাকবে। কেউ কারোর উপর হাত তুলবে না।

(৩) যেসব মুসলমান মক্কায় অবশিষ্ট আছে, তাদের কাউকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না। আর কোন মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না।

(৪) আরবের গোত্রগুলো যে কোন পক্ষের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

(৫) এ সন্ধিচুক্তি দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ শর্তাবলী মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ছিল বলে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিলো। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ সন্ধির প্রত্যেকটি শর্ত মুসলমানদের পক্ষে ছিলো এবং এরই মধ্যেই লুকায়িত ছিলো মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয়। যা পরবর্তীতে সূরা ফাতাহ নাযিল করে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর মাত্র দুই বছর পরে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো বাস্তবরূপ লাভ করে।

বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ

৬ষ্ঠ হিযরীর শেষ দিকে রাসূল (সা.) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও আমীরের নিকট চিঠি প্রেরণ করে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। চিঠি লেখানোর পর রাসূল (সা.) কয়েকজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবাদের কয়েকজনকে চিঠিসহ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। সপ্তম হিযরীর ১ মুহার্‌রম তারিখে রাসূল (সা.) এ সকল দূত প্রেরণ করেন।

(১) রোম সম্রাট (কায়সার) হিরাক্লিয়াসের নামে পত্র : এই চিঠি ওহিয়া কালবী (রা.)-এর হাতে প্রদান করা হয়।

(২) পারস্য সম্রাট (কিসরা) খসরু পারভেজের নামে প্রত্র : হযরত আব্দুল্লাহ বিনখাজাফা সাহমী (রা.)-এর হাতে প্রদান করা হয়।

(৩) মিশরের শাসক আজিজের নামে পত্র : হযরত হাতিব বিন আবি বালতায়া (রা.)-এর হাতে প্রদান করা হয়।

(৪) আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র : হযরত উমর বিন উমাইয়া (রা.)-এর হাতে প্রেরণ করা হয়।

(৫) মুনযির ইবনে সাদির নামে পত্র : হযরত আলা ইবনে হাযরামির হাতে প্রেরণ করা হয়।

(৬) ইমামার শাসনকর্তার হাওজা ইবনে আলীর নামে পত্র : হযরত সালীত ইবনে আমর আমেরিকে মনোনিত করা হয়।

(৭) দামেশকের শাসনকর্তা গাসসানির নামে পত্র : হযরত সুজা ইবনে ওয়াহাবের হাতে প্রেরণ করা হয়।

(৮) আম্মানের বাদশা যেফার এবং তার ভাইয়ের নামে পত্র : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাতে প্রেরণ করা হয়।

এ সকল চিঠির মাধ্যমে রাসূল (সা.) বিশ্বজাহানের অধিকাংশ এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। পত্রের জবাবে কেউ ঈমান এনেছে আবরা কেউ কুফুরীর উপরই অটল থেকেছে। তবে এ সকল চিঠির প্রভাব এটুকু হয়েছে যে, যারা কুফুরী করেছে তাদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের নাম এবং প্রচারিত দ্বীন একটি পরিচিতি পেয়েছে।

রোম সম্রাট (কায়সার) হিরাক্লিয়াসের নামে পত্র প্রেরণ। পত্রটি নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর তরফ থেকে রোমের প্রধান শাসক হিরাক্লিয়াসের নামে।

'যে সত্যপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি নাযিল হোক। এরপর আমি তোমাকে ইসলাম অনুসরণের আহবান জানাচ্ছি।

'আল্লাহর আনুগত্য কবুল কর, তুমি শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিফল প্রদান করবেন। কিন্তু তুমি আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হলে তোমার দেশবাসীর অপরাধের জন্য তুমি দায়ী হবে। কারণ তোমার অস্বীকৃতির কারণেই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে পারছে না।'

'হে আহলি কিতাব! এস এমন একটি কথার দিকে, যা উভয়ের মাঝে সমান; তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের মাঝেও কেউ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে নিজের প্রভূ হিসেবে চিহ্নিত করবো না। কিন্তু তোমরা এ কথা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি জানালে আমরা সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছি যে, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম অর্থাৎ আমরা শুধু আল্লাহর 'ইবাদত ও বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকবো।'

মক্কা বিজয় [৮ম হিযরী, ১০ রমজান মাস]

ইমাম ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, 'এটা সেই মহান বিজয় যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে, তাঁর রাসূল (সা.)-এর বাহিনীকে এবং তাঁর দ্বীনের আমানতদারদের মর্যাদা দান করেছেন। এছাড়া তাঁর শহরকে তাঁর নিজের ঘরকে, যে ঘরকে দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম করেছিলেন, সেই ঘরকে কাফের মুশরিকদের হাত হতে মুক্ত করেছিলেন। এই বিজয়ের ফলে মানুষ

দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। বিশ্ববাসী খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠে।'

অষ্টম হিযরীর ১০ রমজান। রাসূল (সা.) মদিনা ছেড়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো আত্মোৎসর্গী দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী। এ সময় মদীনার তত্ত্বাবধানের জন্য আবু রাহাম গেফারীকে নিযুক্ত করা হয়। প্রতিমধ্যে অন্যান্য আরব গোত্রের লোকেরাও তাঁর সাথে মিলিত হন। যাহাফা নামক স্থানে রাসূল (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর সাথে দেখা হয়, তিনি তখন স্বপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিযরত করছিলেন।

এ দিকে মুসলিম বাহিনী যখন মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে তখন তাদের গতিবিধি দেখার জন্য কুরাইশ প্রধান আবু সুফিয়ান গোপনে সেখানে আসে। এ সময় মুসলিম বাহিনী তাকে পাকড়াও করে রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির করেন। এ ব্যক্তি একাধিক বার রাসূল (সা.)-কে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত পর্যন্ত করেছিলে। এসব গুরুতর অপরাধের কারণে আবু সুফিয়ানকে সাথে সাথে হত্যা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু রাসূল (সা.) তার প্রতি করুণার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন। ফলে আবু সুফিয়ান বাধ্য হয়ে ইসলাম কবুল করেন।

এ সময় হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান মর্যাদাবান লোক কাজেই তাকে কোন মর্যাদা দেয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহর রাসূল (সা.) তখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বললেন, ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি নিজের ঘরে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।'

এবার রাসূল (সা.) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে পিছন দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু কাউকে হত্যা করবে না। অবশ্যই কেউ

যদি তোমার উপর অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য তুমিও তা করবে।' এ বলে রাসূল (সা.) নিজে সামনের দিক থেকে শহরে প্রবেশ করেন।

হযরত খালিদের সৈন্য বাহিনীর উপর কিছু কুরাইশ তীর নিক্ষেপ করলে তিন জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ (রা.) তাদেরকে প্রতিহত করলে ১৩ জন হামলাকারী নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে যায়। এ ছাড়া কোন ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই বিনা রক্তপাতে রাসূল (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর সৈন্যদের হাতে একটি লোকও নিহত হলো না।

কা'বা ঘরে প্রবেশ

রাসূল (সা.) মোহাজেরদের সাথে নিয় মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। সর্বপ্রথম তিনি হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। সে সময় রাসূল (সা.)-এর হাতে একটি ছড়ি ছিল। ঐ সময় কা'বা ঘরে তিনশত ষাটটি মুর্তি ছিল। রাসূল (সা.) তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মুর্তিগুলোকে গুতাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। নিশ্চয় অসত্য চলে যাওয়ার মত।' এরপর তিনি মুর্তিগুলোকে কা'বা ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘরকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা হলো।

রাসূল (সা.) তাকবীর ধবনি দিলেন, এরপর কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করেন। তিনি ওসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তাঁর নিকট থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিলেন। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে কা'বা ঘর খোলা হলো। ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে অনেকগুলো ছবি দেখতে পেলেন এবং একটি কাঠের তৈরি কবুতরও দেখলেন। নিজ হাতে তিনি সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর নির্দেশে ছবিগুলো নষ্ট করা হলো। আর এটাই ছিল তাঁর বিজয় উৎসব।

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের ফলে যাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিলো তারা আরো অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের ভিতরে বিদ্বেষ ও বিরুধীতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এ ব্যাপারে হুনায়েনের অধিবাসী হাওয়াজেন ও সাকিব গোত্র দুইটি সবচেয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। তারা এমনিতেই খুব যুদ্ধবাজ লোক ছিল। তারা উভয় গোত্রের প্রধানরা একত্র হয়ে পরামর্শ করলো যে, পরিস্থিতি যা-ই-হোক না কেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তারা মুসলমানদের প্রতিহত করবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মালিক ইবনে আওফ নাযায়ী নামে তাদের এক সরদারকে বাদশা মনোনীত করে মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

রাসূল (সা.) এ প্রস্তুতির খবর জানতে পেরে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন এ ধরনের ফিতনা নির্মুল করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ম হিযরীর ১০ শাওয়াল ১২ হাজার সৈন্যসহ রাসূল (সা.) শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য যাত্রা শুরু করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ব্যাপক এবং যুদ্ধ সরঞ্জামও ছিল প্রচুর। এটা দেখে অনেক যোদ্ধাদের মনে এ ধারনা হলো যে, আজ দুশমনরা আমাদেরকে কোনভাবে প্রতিহত করতে পারবে না; বরং অচিরেই তারা ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে। এমনকি কোন কোন মুসলমান বলেই ফেলল যে, আজ আর আমাদের উপর কেহ বিজয়লাভ করতে পারবে না।

হুনাইন মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি একটি উপত্যকা। এখানেই এ ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মুসলমানেরা সামনে আসা মাত্রই শত্রুরা আশপাশের পাহাড় থেকে এলাপাথারি তীর নিক্ষেপ করে। এর ফলে মুসলিম সৈন্যদলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, ফলে কিছুক্ষণের জন্য তারা ময়দান ত্যাগ করে। এ পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকেন। শত্রুদের প্রতিহত করেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার জন্য আহবান জানাতে থাকেন।

রাসূল (সা.)-এর দৃঢ়তা ও ধৈর্য দেখে মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় ময়দানে আসতে শুরু করে এবং নতুন উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানেরা পুরোপুরি জয়লাভ করে। হুনায়েনের যুদ্ধে কাফেরদের প্রায় ৭০ জন নিহত হয় এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি বন্ধি হয়।

তাবুক অভিযান [নবম হিযরী, রযব মাস]

নবম হিযরীর যুলহাজ্জ থেকে রজব মাস পর্যন্ত রাসূল (সা.) মদিনায় অবস্থান করেন এবং পরে মুসলমানদেরকে রোম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। এ সময়টা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। একদিকে ছিল গ্রীষ্মের প্রচন্ড খরতাপ। অন্যদিকে দেশে চলছিলো দুর্ভিক্ষ। মৌসুমটা ছিল খেজুর সংগ্রহের। ঠিক এ সময় বাইরে যাওয়াটা অনেকের মনোপুত ছিল না। এমতাবস্থা রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযানে যথাপযুক্তভাবে প্রস্তুতিসহ অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছিল এক কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ। যুদ্ধের সামানপত্রও পরিপূর্ণ ছিল না। সফর ছিল সুদীর্ঘ পথের। সর্বোপরি মোকাবিলা ছিল এক বিশাল বাহিনীর সাথে। এরপরও রাসূল (সা.) পরিস্থিতির অবস্থা উপলব্ধি করে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেন। কোথায় কি উদ্দেশ্যে যেতে হবে তাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন।

রাসূল (সা.) অবশেষে নবম হিযরীর রযব মাসে ৩০,০০০ (ত্রিশ) হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। এর মধ্যে ১০ (দশ) হাজার ছিল অশ্বারোহী। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, একটি উটের পিঠে পালাক্রমে কয়েকজন করে সৈন্য সওয়ার হতে থাকে। রাসূল (সা.) তবুকে পৌঁছে জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট কায়সার সীমান্ত হতে তার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছে; তাই যুদ্ধ করার মত আর কেহ অবশিষ্ট নেই। এখানে রাসূল (সা.) ২০ দিন অবস্থান করেন। এরপর বিপুল পরিমাণ গনিমতসহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রোম সম্রাট এর সৈন্য প্রত্যাহেরর কারণ হিসেবে যা জানা যায় তাহলো, বাদশা কায়সারের এত বড় প্রস্তুতির খবর পেয়েও মুসলমানেরা যখন নিঃশংকচিত্তে তাদের প্রতিহত করার জন্য মদিনা থেকে যাত্রা করেছে এবং ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই তারা সৈন্য সরিয়ে নেওয়াই সমুচিত মনে করে। কারণ এর আগে মুতা যুদ্ধের সময় ১,০০,০০০ সৈন্যের সামনে মাত্র ৩০০০ মুসলমান কিরূপ বীরত্ব দেখিয়েছিল সে অভিজ্ঞতা তার মন থেকে মুছে যায়নি। তাই যখন সে জানতে পারলো এবার ৩ (তিন) হাজার নয়; ৩০০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূল (সা.) স্বয়ং আসছেন। তখন সে এ বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান না করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিদায় হজ্জ ও রাসূল (সা.)-এ ইন্তিকাল [দশম হিযরী, ৬৩২ খ্রিঃ]

দশম হিযরীতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করছিল। তবে হিযরতের পর দু'বার উমরাহ পালন করলেও তখনও পর্যন্ত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা. একবারও পবিত্র হজ্ব পালন করতে পারেননি। সুতরাং এবার তিনি হজ্ব আদায় করার মনস্থ করলেন। এটি ছিল তার নবুওয়াতের জীবনে প্রথম ও শেষ হজ্ব। অপর দিকে বিদায় হজ্ব এ জন্য বলা হয় যে, তিনি এ হজ্বে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

এ হজ্বে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন তা বিশ্বের সকলের জন্য একমাত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। ভাষণে তিনি বলেছিলেন, হে মানবকূল। স্বরণ রেখো, বাসভূমি, বর্ণ ও গোত্র নির্বেশেষে প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই, এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ এবং সমপর্যায় ভুক্ত। আজ হতে বংশগত কৌলন্য বিলুপ্ত করা হলো। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলিন, যে স্বীয় কার্যের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তিনি আরো বলেন, তোমরা তোমাদের দাস-দাসী বা অধিনস্তদের সম্পর্কে সতর্ক হও। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদেরকে নির্যাতন করার অধিকার তোমাদের নেই।

নিজে যা খাবে ও পরবে তাদেরকে তাই খাওয়াবে ও পরাবে। তারা অপরাধ করলে মার্জনা করবে অথবা মুক্তি দান করবে। স্মরণ রেখো তারাও তোমাদের মত মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি।

ইন্তিকাল

১১ হিযরীর সফর মাসের ১৮ বা ১৯ তারিখে রাসূল (সা.)-এর শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। সে দিন ছিল বুধবার। পরবর্তী সোমবারে অসুস্থতা আরো তীব্রতর হয়। যতক্ষণ শক্তিতে পেরেছিল ততক্ষণ তিনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ালেন। সর্বশেষ তিনি মাগরিবের নামাজ পড়িয়েছিলেন। তখন মাথায় প্রচন্ড বেদনা ছিল। তিনি মাথায় রুমাল বেঁধে মসজিদে এলেন এবং নামাজে সূরা মুনসালাত পাঠ করেছিলেন। এশার সময় আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই মসজিদে আসতে না পেরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে নামাজের ইমামতি করতে বলেন। এরপর কয়েক দিন পর্যন্ত আবু বকর (রা.) নামাজ পড়ালেন।

একদিন রোগ যন্ত্রণা খুবই বেড়ে গেল। কখনো রোগ যন্ত্রণা বেড়ে যায় আবার কমে যায়। মৃত্যুর দিন সোমবার ১১ হিযরী, ১২ রবিউল আউয়াল এ দিনে রাসূল (সা.)-এর শরীর অনেকটা সুস্থ ছিল। কিন্তু সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকে, ততই ঘন ঘন জ্ঞানহারা হতে থাকেন। এ অবস্থায় প্রায় তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো, 'হে আল্লাহ! তুমি মহান বন্ধু।' আবার বলতেন, 'এখন আর কেউ নেই, তিনিই বড় বন্ধু।' এসব বলার অবস্থাতেই অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। এক সময় রূহ পাক আলমে কুদসে গিয়ে পৌঁছে যায়। [ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

পরের দিন কবর, কাফন, জানাজা সমাধা করা হয় এবং সন্ধায় যে ঘরে ইন্তিকাল করেন, সে ঘরেই রাসূল (সা.)-কে দাফন করা হয়।

নোট